বর্ষার দারুণ এক অলঙ্কার

কদম ফুল

আমি তোমাকে কতবার বলেছি/আমি বৃক্ষের মতো অনড় নই/তুমি যতবার ফিরে এসেছ ততবারই ভেবেছ/আমি কদমবৃক্ষ হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকব/কিন্তু এখন দেখ, আমি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলেও/হয়ে গিয়েছি বৃক্ষের অধিক এক কম্পমান সত্তা।/বাঁশি বাজিয়ে ফুঁ ধরেছি/আর চতুর্দিক থেকে কেঁদে উঠেছে রাধারা/আমি কি বলেছিলাম ঘর ভেঙে আমার কাছে এসো/আমি কি বলেছিলাম যমুনায় কলস ভাসিয়ে/সিক্ত অঙ্গে কদমতলায় মিলিত হও/আমি তো বলিনি লাজ লজ্জা সংসার সম্পর্ক/ যমুনার জলে ভাসিয়ে দাও/ আমি তো নদীর স্বভাব জানি, স্রোত বুঝি, কূল ভাঙা বুঝি/ কিন্তু তোমাকে বুঝতে বাঁশিতে দেখ কতগুলো ছিদ্র!/সব ছিদ্র থেকেই ফুঁ বেরোয়/আর আমার বুক থেকে রক্ত।

মাসুম আওয়াল

কবিতাটির নাম ‘কদম ফুলের ইতিবৃত্ত’। লিখেছেন কবি আল মাহমুদ। মন ছুঁয়ে যায় কবিতাটি। যেমন মন ছুঁয়ে যায় কদম ফুল। দূর থেকে কোনো কদম ফুল ভরা গাছের দিকে চেয়ে থাকলে মনে হবে ঠিক যেন কোনো হলদে রঙের ছাতা। তার ছায়াতে দাঁড়ালে প্রাণ জুড়াবে মিষ্টি ঘ্রাণে। বর্ষা যখন প্রকৃতির দুয়ারে কড়া নাড়ে, তখন হেসে ওঠে কদম ফুল। সৌরভ মাখা কদম উপহার হিসেবেও মন্দ নয়, হাতে পেলেই নেচে ওঠে মন।

কদম ফুলের বাড়িতে কিছুক্ষণ

কদম ফুলের বাড়ি কোথায়? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কদমের আদি বাসস্থান। বাংলাদেশে সব অঞ্চলে বিশেষ করে নিচু এলাকায় এটি ভালো জন্মে। এর প্রজাতির সংখ্যা ২টি। ছয় ঋতুতে ঘেরা বৈচিত্র্যময় এই দেশে কদম ফোটে আষাঢ় মাসে। বর্ষা-প্রকৃতির দারুণ এক অলঙ্কার কদম ফুল। গ্রামের বৃষ্টি ভেজা মাটির এক পথ। চারপাশে সবুজ প্রকৃতির হাতছানি। খানিকটা দূরেই একটা মাঝবয়সী কদম গাছ। এত ফুল ফুটেছে গাছটাতে! পাতা দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টিতে ভিজছে একদল কিশোর কিশোরী। দুই দস্যি কিশোর গাছে উঠেছে। কদম ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছে তারা। আর হুটোপুটি করে ছেলে মেয়েরা ফুল কুড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় কদমের হলুদ পাঁপড়ি ছড়িয়ে কোঁচড়ে রাখছে ওরা।

অনেক অনেক পাঁপড়ি জমেছে। তারপর শুরু হলো খেলা। লাফ ঝাঁপ। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিতে শুরু হয় কিশোর কিশোরীদের হুল্লোড়। বৃষ্টি তো নামছেই, মাথার উপর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে কদমের পাঁপড়ি। আর সেসব বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে মাথার উপর। এমন কদমের বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দই অন্যরকম।

সাহিত্যে কদমফুল

প্রাচীন সাহিত্যের একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে কদম ফুল। মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য জুড়ে আছে কদমের সৌরভ মাখা রাধা-কৃষ্ণের বিরহ গাথা! ভগবৎ গীতা থেকে শুরু করে লোকগাথা, পল্লীগীতি ও রবীন্দ্র-কাব্য পর্যন্ত কদম ফুলের উল্লেখ রয়েছে। ভানুসিংহের পদাবলি, বৈষ্ণব পদাবলি ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে নানাভাবে, নানা আঙ্গিকে এসেছে কদম গাছের কথা। বহুল উপমায় বিভূষিত তার গুণ গাথা। বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখা যায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের আকুতি:

নির্জন যমুনার কূলে/বসিয়া কদম্ব তলে/বাজায় বাঁশি বন্ধু শ্যামরায়।/বাঁশিতে কি মধু ভরা/ আমারে করিল সারা/আমি নারী ঘরে থাকা দায়/কালার বাঁশি হলো বাম/বলে শুধু রাধা নাম/কুলবধূর কুলমান মজায়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা গানে এসেছে কদম ফুল। বর্ষার আগমনী গান হিসেবে পরিচিত গানটির কথায় ধরা যাক। কবি লিখেছেন, 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান, আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান।' জ্যোতিষ-শাস্ত্রতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'কদম গাছের ডালে পূর্ণিমা-চাঁদ আটকা পড়ে যখন সন্ধেকালে/ তখন কি কেউ তারে ধরে আনতে পারে।' ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'গহন তিমির নিশি ঝিল্লিমুখর দিশি শূন্য কদম তরুমূলে, ভূমিশয়ন-'পর আকুল কুন্তল, কাঁদই আপন ভুলে।' রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন, 'কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া খেলে/পিয়ালগুলি নাটের ঠাটে হাওয়ায় হেলে/বরষণের পরশনে/শিহর লাগে বনে বনে/বিরহী এই মন-যে আমার সুদূর পানে পাখা মেলে।'

নজরুলও তার সাহিত্যে কদমফুলকে এনেছেন নানাভাবে। নজরুল লিখেছেন, 'রিমঝিম রিমঝিম ওই নামিল দেয়া/শুনি শিহরে কদম, বিদরে কেয়া/ঝিলে শাপলা কমল ওই মেলিল দল/মেঘ-অন্ধ গগন, বন্ধ খেয়া।' 'বউ কথা কও পাখি' কবিতায় এই কদমের কথাই নজরুল আবার বলেন আরেকভাবে, 'উড়ে গেছে কোথা, বাতায়নে বৃথা/বউ করে ডাকাডাকি।/চাঁপার গেলাস গিয়াছে ভাঙ্গিয়া, পিয়াসী মধুপ এসে/কাঁদিয়া কখন গিয়াছে উড়িয়া কমল-কুমদী দেশে।' কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও এসেছে কদম ফুল। অস্তচাঁদে কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'ফুলটি ফুটিলে চাঁদিনী উঠিলে' এমনই রূপালি রাতে, কদমতলায় দাঁড়াতাম গিয়ে বাঁশের বাঁশিটি হাতে!' আবার 'একদিন খুঁজেছিনু যারে' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন, 'মালতীলতার বনে, কদমের তলে, নিঝুম ঘুমের ঘাটে কেয়াফুল, শেফালীর দলে!' জীবনানন্দ দাশ তার পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কবিতায় তৈরি করেছেন অন্যরকম এক ঘোর। কবি লিখেছেন, 'কদমের ডালে আমি শুনেছি যে লক্ষ্মীপেঁচা গেয়ে গেছে গান/নিশুতি জ্যোৎস্না রাতে, - টুপ টুপ টুপ টুপ সারারাত ঝরে/শুনেছি শিশিরগুলো ম্লানমুখে গড় এসে করেছে আহ্বান।' পল্লী কবি জসীমউদ্দীন 'পল্লী বর্ষা' কবিতায় লিখেছেন, 'কাহার ঝিয়ারি কদম্ব শাখে নিঝুম নিরালায়/ছোট ছোট রেণু খুলিয়া দেখিছে অস্ফুট কলিকায়!/ বাদলের জলে নাহিয়া সে মেয়ে হেসে কুটি কুটি হয়/ সে হাসি তাহার অধর নিঙড়ি লুটাইছে বনময়।' নাগরিক কবি শামসুর রাহমানের 'এমন বর্ষার দিনে' কবিতাটির কথা না বললেই নয়। কবি লিখেছেন: সেই বাদল দিনের ফুল কদমের বুনো ঘ্রাণের কাছে, এখন দেখছি আমি/কবেকার তোমার আঠারো বছরকে চুমু খাচ্ছে আনন্দে/নিভৃতে খোলা ছাদে কাচের গুঁড়োর মতো বৃষ্টি।/বাদল দিনের ফুল কদমের বুনো ঘ্রাণে শিহরিত তুমি ক্ষণে ক্ষণে।/এমন বর্ষার দিনে তোমার কি সাধ জাগে/ কেউ নিরিবিলি টেলিফোনে 'রাধা' বলে ডাকুক তোমাকে?' জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের কাব্যগীতেও কদম ফুল এসেছে এভাবে: যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো/চলে এসো এক বরষায়/যদিও তখন আকাশ থাকবে বৈরী/কদমগুচ্ছ হাতে নিয়ে আমি তৈরি/কদমগুচ্ছ খোঁপায় জড়ায়ে দিয়ে/জলভরা মাঠে নাচিব তোমায় নিয়ে/তুমি চলে এসো, চলে এসো এক বরষায়। হুমায়ূন আহমেদ তার একটি উপন্যাসের নাম রাখেন 'বাদল দিনের দ্বিতীয় কদম ফুল'। কদম নিয়ে ছড়া-কবিতাও রয়েছে অনেক। 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদম তলায় কে/হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে সোনামণির বে'- এমন বহু ছড়ায় এখনও কদমের মহিমা প্রকাশ পায় মানুষের মুখে মুখে।

কী নামে ডাকবো তোমায়

কদমের সংস্কৃত নাম কদম্ব। কদম্ব মানে হলো দয়া! কদম ফুলের আছে আরও অনেক নাম। ললনাপ্রিয়, সুরভী, কর্ণ পূরক, মেঘাগমপ্রিয়, বৃত্তপুষ্প ছাড়াও নীপ নামেও পরিচিত এ কদম ফুল।

কদমকথা

কদমের একেকটি গাছ ৪০ থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এর সবুজ ঝরঝরে পাতার মাঝে থাকা গোলাকার কদম ফুল বর্ষায় আরও রূপসী হয়ে উঠে। কদম ফুল দেখতে বলের মতো গোল, মাংসল পুষ্পাধারে অজস্র সরু সরু ফুলের বিকীর্ণ বিন্যাস। এই ফুলের রং সাদা-হলুদে। তবে পাপড়ি ঝরে গেলে শুধু হলুদ রঙের গোলাকার বলের মতো দেখা যায়। এই গাছের ফল মাংসল, টক এবং বাদুড় ও কাঠবিড়ালির প্রিয় খাদ্য। কদম গাছও বেশ উপকারী।

টক-মিষ্টি কদম ফল

কদম গাছের ফুল ছাড়া আরও রয়েছে ফল। এ ফলগুলো দেখতে অনেকটা লেবুর মতো। কদম ফল পাকলে ফলটি অনেকে খায়। একটা ফলের ভেতরে প্রায় ৮ হাজার বীজ থাকে। পাখি, বাদুড়, কাঠবিড়ালির খুব প্রিয় এই ফল। পাখিদের খাদ্য ধ্বংস করে দিচ্ছি কি না সেটা ভেবে দেখা দরকার এবং অযথা ফুল ছেঁড়া বন্ধ করা উচিৎ। ফুল বেশি বেশি ছিঁড়লে যেকোনও উদ্ভিদের বিস্তার ব্যাহত হয়। কারণ ফল পরিপক্ক না হলে বীজের অঙ্কুরোদগম হবে না। তবে ফল পেকে গেলে এটা ফেটে যায় এবং বাতাস অথবা বৃষ্টির পানির মাধ্যমেও বীজের বিস্তার ঘটে।

কদমের উপকারিতা

শিশুদের কৃমির উপদ্রবে কমদ পাতা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ৪-৫ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে ২০০ মিলি কচি কদম পাতার রস দিনে একবার খাওয়াতে হয়। মুখের দুর্গন্ধ সরাতে কদম ফুল কুঁচিয়ে পানিতে সেদ্ধ করে সেই পানি দিয়ে কুলকুচা করলে উপকার মেলে। এতে দুর্গন্ধ দূর হয়। টিউমারের ব্যাথা উপশমের জন্য কদমের কচি ছাল চন্দনের মতো বেটে গরম করে টিউমার প্রলেপ দিলে ফোলা ও ব্যথা দুয়েরই উপশম হয় বলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ দাবি করেন। কদম ছালের গুঁড়া, আফিম ও ফিটকিরি সমপরিমাণ মিশিয়ে চোখের চারদিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু প্রদাহ দূর হয়। প্রবল জ্বরে পিপাসা প্রবল হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় কদম ফলের রস খাওয়ালে পিপাসা দূর হয়। মুখে ঘা বা ক্ষত হলে কদম পাতার ক্বাথ মুখে নিয়ে কুলি করলে সেরে যাবে। পচা ঘা বা ক্ষত ট্যানিনের সংস্পর্শে এলে ক্ষত কোষ অধঃক্ষেপিত হয়ে পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে ও ক্ষত সারিয়ে তোলে। কদমে ক্লুইনোভিক এবং সিনকোট্যানিক এসিড থাকার জন্য এটি ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কদম গাছের ছাল বেটে ত্বকে লাগিয়ে, কদম পাতা দিয়ে বেঁধে রাখলে, ত্বকের বৃদ্ধি অর্থাৎ ফোলা কমে যায়। শিশুর বমি হলে কদমের ত্বকের রস জরাচূর্ণ চিনির সাথে মিশিয়ে খেলে বমি নিবারিত হয়। কদম ছালের রস জ্বর নাশক ও বল বৃদ্ধিকারক।

শেষকথা ও একটি আবেদন

আমাদের চারপাশ জুড়ে অনেক অনেক গাছ দরকার। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রচুর গাছ রোপণ করা প্রয়োজন। একটা বিষয় সবার মনে রাখতে হবে, সব গাছই অক্সিজেন দেয়। তবে কোনো গাছের ফুল প্রিয়, কোনো গাছের ফল। কোনো গাছ কাঠের জন্য মূল্যবান। দেখা যাচ্ছে ফুলে ভরা কদমগাছ দেখতে অসাধারণ হলেও এর আর্থিক মূল্য তেমন একটা নেই। তাই কেউ এর গুণগত মান বুঝে না। তাই কমছে কদম গাছ। ধীরে ধীরে প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে কদম ফুল। বাংলার বিভিন্ন জেলায় এক সময় প্রচুর কদম গাছ চোখে পড়ত। যান্ত্রিক সভ্যতা ও নগরায়নের যুগে মানুষ সামান্য প্রয়োজনে কদম গাছকে তুচ্ছ মনে করে কেটে ফেলছে। অনুরোধ কদম গাছ কাটবেন না। বছর ঘুরে বর্ষা আসবে। কদম ফুল হাসবে। কদম ফুল ছাড়া বেমানান বর্ষা আমাদের কারোই কাম্য নয়। সবাইকে কদম ফুলের শুভেচ্ছা।